শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
(কলিকাতা গেজেট, ১৭ই এপ্রিল ১৯৪৪)

তেপান্তরের মাঠ

[নূতন ধরণের শিশু-উপন্যাস]

'দুঃখজয়ীর জয়যাত্রা' প্রণেতা

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

পুনর্মুদ্রণ
কার্ত্তিক—১৩৫২

উপহার

সুনীল, শক্তি, বাণী, মায়া, গৌরী, মিহির,
ডেইজী, দেবিকা, তুলসী ও কৃষ্ণা—
তোমাদের সবাইকে
দিলাম।

বেঁটে লোকটা বালককে দেখে মারবার জন্য বল্লম তুলে ধরল।

—৩১ পৃষ্ঠা

তেপান্তরের মাঠ

——॰⁂॰——

এক

সোণার স্বপন্

ছোটবেলা ঠাকুরমার কোলের কাছে শুয়ে কুণাল কত গল্পই শুনত! অচিন্-দেশের রাজপুত্তুর, অজানা দেশের রাজকন্যার জন্যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। চারদিকে তার ঘন বন। পথের মাঝে বাঘ-সিংহের গর্জ্জন।

কত কি!

শুনতে-শুনতে ভয়ে-ভাবনায় কুণাল দিশেহারা হয়ে উঠত। রাজপুত্তুরের জন্য সমবেদনায় কুণালের ছোট-ছোট গভীর দুটি কালো চোখে নেমে আসত রাজ্যের যত বেদনা। ঠাকুরমাকে সে জড়িয়ে ধরত।

বল্‌ত: তারপর?

: তারপর* ঠাকুরমা বলে চলতেন: তারপর—দৈত্যপুরীর পথে পা দিতেই রাজকুমারের সাম্‌নে দেখা দিল এক প্রকাণ্ড

দৈত্য। তালগাছের মত লম্বা চেহারা। চোখ যেন দুটি আগ্নেয়গিরি! ধারালো দাঁত।

কুণাল সে-সব গল্প শুনত।

শুনত আর ভাবত—সে-ও বড় হয়ে যাবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে অমনি করে জোর কদমে। হাতে থাকবে তার তলোয়ার। পথের কাঁটাকে তা দিয়ে সরিয়ে ফেলতে আর কতক্ষণ! তারপর নীল সাগরের মণি-মুক্তার দেশে—হীরার খাটে শোয়া রাজ-কুমারীকে সোণার কাঠির পরশ দিয়ে বাঁচিয়ে তুলবে।

রাজকন্যা অবাক্-বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখবে—সম্মুখে তার সুন্দর-লাবণ্যে গড়া এক কুমার-কিশোর। ভয়ে-ভয়ে হয়ত রাজকন্যা বলবেঃ পালাও—শীগগির এখান থেকে পালাও। জাননা এটা রাক্ষসের দেশ!

কুণাল হেসে বলবেঃ জানি। সব জানি।

রাজকন্যা এবার হয়তো খুশী হবে। খাট হতে নেমে এসে কুণালের কাছে দাঁড়িয়ে সে বলবেঃ তবে এক কাজ কর। ঐ যে মন্দির, ওর ভেতর দক্ষিণ কোণে দেখতে পাবে এক মণি-মাণিক্য-খচিত সোণার কৌটো।

কুণাল বলবেঃ কি হবে তা দিয়ে?

রাজকুমারী অবাক্ হয়ে বলবেঃ এই না বলছিলে সব জান? ওর মধ্যে যে রাক্ষস-রাক্ষসীদের প্রাণ!

তারপর আর কি!

রাক্ষসদের মেরে রাজকন্যাকে নিয়ে আসতে আর কতক্ষণ?

কুণাল বসে-বসে, ভয়ে-ভয়ে এ-সব ভাব্‌ত।

কিন্তু বেশীদিন ভাবনা তার চলল না।

মা-মরা ছেলে এই কুণাল। মা তার মরেছেন একেবারে শিশুকালে। মাকে তার মনে নেই একদম্‌!

একটু বড় হতেই বুঝতে পারল, সংসারের চারিদিকে কত দুঃখের আবর্ত্ত! তার বাবা দিন-রাত কত পরিশ্রম করে তাদের জন্য অন্ন জোগান! তা-ও রোজ দু'বেলাই বা জোটে কৈ? অথচ সেই রাত থাকতে বেরিয়ে যান তার বাবা, আর আসেন দুপুরে। ভাতের ওপর শুধু একটু নুন দিয়ে একথালা ভাত খেয়ে, বিশ্রাম না করেই, আবার তাঁকে বেরুতে হয়।

আসেন সেই সন্ধ্যায়।

কিন্তু তবুও কুণালের পড়াশুনার জন্য তাঁর কি ঝোঁক!

সন্ধ্যাবেলায় রোজ তিনি কুণালকে ডেকে নিয়ে কাছে বসান। আদর করে বলেন: দেখতে ত পারছ কুণাল সবই! লেখাপড়া শিখে বড় হও—মানুষ হও।

কুণালের সারা-মন আনন্দে ভরে ওঠে। চোখ দুটি তার জলে ছলছল্‌ করে। বলে: তাই যেন হয় বাবা!

বাবা আশীর্ব্বাদ করেন ঃ তাই হবে।

সত্যিই তাই। ছেলের বয়স পাঁচ পেরুতে না-পেরুতেই প্রথম ভাগ সে শিখে ফেলেছে। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের শিশু-শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উঠেছে প্রথম শ্রেণীতে। একটার পর একটা পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে চলেছে এগিয়ে। যেন পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটে চলেছে তার পথ-যাত্রায়!

বাবার মনে আনন্দ আর ধরে না!

বই আর শ্লেট, পুঁথি আর পত্তর, এখন ওর দিন-রাতের সাথী। ও-পাড়ার তপতীর সাথে এত যে ভাব, তা পর্য্যন্ত যেন ভাটা পড়েছে! বেণী দুলিয়ে তপতী, রোজ একবার করে কুণালের কাছে আসে।

কিন্তু কুণালের অবসর নেই।

সে জানে, ওরা যে বড় গরীব। ওদের মানুষ হয়ে ওঠা যে ওরই হাতে শুধু!

তপতী মুখ ভার করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। কুণাল-দা তার কত-কত বই পড়ে! বড়-বড় মোটামোটা সব বই।

আঁক কসে আবার! ইতিহাস মুখস্থ করে জোরে-জোরে চেঁচিয়ে।

এ-সব দেখে তপতী আর কাছে এগোতে সাহসই পায় না।

একা-একা খেলতে আবার তপতীর ভালও লাগে না।

এনামেলের বাটিটি দিয়া বলিল, আজকের মত এটি বেচে দাও কুণালদা।

—১০ পৃষ্ঠা

রোজই সে আসে। রোজই ম্লানমুখে ফিরে যায়।

একদিন সাহস করে এগিয়ে গেল সামনে। কুণাল তখন পড়ছে ঃ যদি একটা ত্রিভুজের দুই দিক সমান হয়—

তপতী বলল ঃ রাখ কুণাল-দা তোমার ত্রিভুজ।

কুণাল একবার তপতীর দিকে তাকাল। মনোযোগ তখন পর্য্যন্ত পুরোমাত্রায়ই ছিল। কিন্তু হঠাৎ তপতীর কোঁচড়ের দিকে দৃষ্টিপাত হতেই বলল ঃ ওগুলো কি রে ?—

তপতী ভারিক্কি-চালে বলল ঃ জাম। তোমার জন্যেই এনেছি।

কার জন্যে আনা হয়েছে না-হয়েছে, সে-সব নিতান্তই গৌণ আলোচ্য। এ-সব দিকে কুণালের লক্ষ্য নেই।

সে গম্ভীর ভাবে বলল ঃ দেখি !

আর একটিও কথা না-বলে কুণাল সেগুলো দেখল এবং খেতে আরম্ভ করে দিল।

খেতে-খেতে খুশী হয়ে উঠেছে ঃ বাঃ, বেশ মিষ্টি জাম ত ! কোথায় পেলি রে ?

তপতী বলল ঃ মরা-নদীর সোঁতার ধারের সেই বুড়ো গাছটায়। কী জামই যে হয়েছে এবার কুণাল-দা। পাকা-পাকা, এই এতো বড়-বড়।

তপতী তার ছোট দু'খানি হাত দিয়ে একটা কাল্পনিক পরিসর দেখাল।

ঃ তাই নাকি? * কুণাল খেতে-খেতে বলল ঃ এতদিন বলিসনি কেন?

তপতী বলল ঃ তোমার ত এখন কেবল পড়া আর পড়া!

কুণাল উঠল—বলল ঃ চল্ জাম খাইগে। এতক্ষণে থাকলে হয়!

তপতী হেসে বলল ঃ সে-গাছের কথা কেউ জানে না। আর এবার কারু ঘরেই পয়সা নেই যে কিনে জাম খাবে। কী যে অজন্মা হয়েছে দেখছ না? ধীরু মামা বলছিলেন—দুর্ভিক্ষ হতে পারে।

ঃ দুর্ভিক্ষ হয় হোক।

তখনকার মত বই-পত্তর পড়ে রইল। দুজনে চলল মরা-নদীর সোঁতার ধারের সেই বুড়ো জামগাছটার দিকে।

ঃ সত্যি, কী জামই যে হয়েছে!

দুই
উৎকট সত্য

কিন্তু জাম খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। তপতী যা বলেছিল তাই ঠিক। পর-পর ক'বছর অজন্মাতে আশে-পাশের সমস্ত গ্রামে কান্নার রোল উঠেছে।

গ্রামে দুর্ভিক্ষ ত লেগেই ছিল বলতে গেলে! এবারে এলো আরো বেশ ভাল করে চেপে,—তার ডানায় হাহাকার। একটা ক্ষুধার্ত্ত বেসুর যেন বাজছে ঘরে-ঘরে। চারদিকে 'নেই, নেই' ধ্বনি শুধু শোনা যায়। কারো ঘরেই এক মুঠো খাবার নেই।

কুণাল এতদিন তার বাবার জন্যেই কিছু জানতে পারেনি। যতদিন তিনি পেরেছেন, সংসার টেনেছেন। কিন্তু ধীরে-ধীরে ঘরের আসবাব-পত্র বিক্রী হতে সুরু হয়ে গেল। মায়ের সেই কত সাধের সুন্দর রঙ্গীন কাপড়খানা পর্য্যন্ত কুণালের বাবা একদিন কাঁদতে-কাঁদতে নিয়ে গেলেন হাটে—আট গণ্ডা পয়সা নিয়ে ফিরে এলেন ঘরে। তোষক গেছে, বালিশ গেছে, মাদুর-চাটাই কিচ্ছু নেই। শীতের জামা-কাপড়—সবই শেষ!

সব গেছে!

এক আনা, দু' আনা, চার আনা—যা পাওয়া যায়!

লোকেই বা কিনবে কি?

বলে—তাদেরই পয়সা নেই।

সত্যি, সমস্ত গ্রাম—এবং গ্রামের চার ধারে যত গ্রাম—সবাই দুর্ভিক্ষের কবলে লুটিয়ে পড়ল। সহর হতে মহাজন আসছে টাকা নিয়ে। যাদের অবস্থা একটু ভাল, তাদের এক টাকা দিয়ে দু'টাকা লিখিয়ে চড়া-সুদে সে-সব দিতে লাগল দু'-এক টাকা করে।

তপতীদের অবস্থা যে আরো খারাপ।

কি করে চলছে তাদের, কে জানে ?

এই ক'দিন কুণাল বাড়ীর বাইরে যেতে পারেনি। আজ ভাবছিল তপতীদের ওখানে যাবে।

কিন্তু যেতে হল না, তপতীই এসেছে।

ম্লানমুখ। চেহারা—কালো বিবর্ণ হয়ে গেছে।

কুণালের মত ছোট্ট কিশোর বালক পর্য্যন্ত বুঝতে পেরেছে যে, কেন এমন চেহারা হয়েছে তা জিজ্ঞেস করতে নেই!

চুপ করে সে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর বলল ঃ খেয়েছিস কিছু তপতী ?

তপতী মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ঝর্-ঝর্ করে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে-ধীরে বলল ঃ আমার জন্যে ত কিছু ভাবিনে কুণাল-দা, কিন্তু মা আজ তিনদিন যে কিছুই খাননি।

তপতী একটু চুপ করে আবার বলতে লাগল ঃ ঘরে এইটিই ছিল শেষ সম্বল।

বলে কাপড়ের নীচ হতে বের করল একটি ছোট্ট এনামেলের বাটি।

বলতে লাগল ঃ এইটি তুমি কারো কাছে বেচে দাও কুণাল-দা! আজকের মতো ত চলুক।

কুণাল হাসল ঃ পাগল! ওতে কিছুই হবে না। আয় এক কাজ করি। ঘরের কোণে আমাদের মেলাই পুঁইডাঁটা আছে এখনও। তুই সিদ্ধ কর। ঘরে একটু নূনও আছে! বেশ হবে। আমরাও খাইনি রে আজ। বাবা ত কাল যে কাজে গেছেন, এখনও এলেন না!

যে জানে না, তাকে দুর্ভিক্ষ যে কি ভয়ানক—তা বোঝান শক্ত। ঘরে খাবার নেই—দোকানে নেই সওদা—হাতে নেই পয়সা।

ঘরের কোণে বোবা অন্ধকারে নির্জ্জীব বেদনায় সবাই কাঁদে। স্তন্যপায়ী শিশু পর্য্যন্ত এক ফোঁটা দুধের জন্য হাহাকার করতে করতে রক্তহীন মায়ের দুগ্ধহীন স্তন চেটে দুধ বার করার দুর্ব্বার বাসনায় কাঁপতে কাঁপতে একেবারে থেমে যায়।

চোখের সামনে এমনি সব ঘরে।

ছেলে মরে, স্বামী মরে, কন্যা মরে—সব ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে থাকে। এ দৃশ্য কল্পনা করাও কঠিন।

আর এর সুযোগ নিয়ে আসে আড়কাঠির দল। তারা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কিনে নিয়ে যায়—চালান দেয় বড় বড় কয়লার আর লোহার কারখানায়। সমস্ত জীবনের জন্য এরা হয়ে ওঠে দাস।

বাপ-মা বিক্রী করে।—

হয়তো শুনতে খারাপই শোনায়; কিন্তু তবু ত চোখের সামনে এদের মৃত্যু দেখতে হবে না। খেয়ে ত বাঁচবে!

হয়তো তাই বিক্রী করে।

গ্রামের সবাই আশা করেছিল গ্রামের জমিদার বিপিন মুন্সী কিছু একটা মীমাংসা নিশ্চয়ই করবেন। অগাধ তাঁর জমি-জমা—অগাধ তাঁর বিত্ত। সরকারের বিশেষ সুনজরে থাকার জন্যে ডেপুটিগিরি করে মেলাই অর্থ জমিয়েছেনও। অবশ্য তাঁর কাছ থেকে একটা কাণাকড়িও আদায় করার কেউ কল্পনা করেনি; কিন্তু সকলেই ভেবেছিল, এই সময়ে কিছু একটা তিনি করবেনই নিশ্চয়। হাজার হোক্, তিনি গ্রামের জমিদার ত!

লোকটা সংসারে চিনেছে শুধু পয়সা। তাঁর একটি কপর্দ্দকও তাঁর কাছে, তাঁর জীবনের চেয়েও মহা-মূল্যবান্।

গ্রামের এই দুর্দ্দশা দেখে প্রথমতঃ তিনি পাঠালেন নিজের বাড়ীর সবাইকে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে খুলে বসলেন তাঁর বাকী-পাওনার হিসাব।

লোকগুলো মরে মরুক আপত্তি নেই—কিন্তু তাঁর হকের ধন যাবে কেন? আর এই ফাঁকে টাকাটা আদায় না করলে, আদায় করার সম্ভাবনাও কম।

সবাইকে তিনি বললেনঃ এক কাজ কর—দু'-এক সের চাল না-হয় আমি দিচ্ছি, কিন্তু শুধবি কি করে তোরা?

চালের নামে সবাই ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

জমিদার বলে চলেনঃ এক কাজ কর—জমি-জমা যা আছে তোদের, লিখে দে সব আমার নামে।

এক সের চাল তখন একটা সাম্রাজ্য!

লেখাপড়া করে যে-যার দিয়ে দিল সব। বিনিময়ে পেল এক সের, দু' সের করে চাল।

চোখের সামনে শিশুরা মরবে, নারীরা মরবে—কে দেখতে পারে তা?

কিন্তু অভাবের দিনে ক্ষিদে পায় যেন আরো বেশী!

জমিদার ওদিকে কাগজ-পত্র নিয়ে সরে পড়েছেন কলকাতায়

আবার যেই সেই !

তবু ভরসা ছিল জমিদারের স্ত্রী যদি থাকতেন এখানে! সবাই মিলে গিয়ে কেঁদে-কেটে পড়লে একেবারে নিরাশ তিনি কিছুতেই করতেন না। অমন মুর্ত্তিমতী লক্ষ্মী! কিন্তু তিনিও নেই।

গ্রাম আবার কেঁদে উঠল।

আশা নেই, ভরসা নেই। চারিদিকে শুধু ধূ-ধূ করছে বিষাক্ত ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষ্মণ। আকাশে এদিকে সুরু হয়েছে কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড তাণ্ডব গর্জ্জন।

যে-বৃষ্টির অভাবে এই অজন্মা, সে এসেছে !

বৃষ্টি এসেছে। আসবার সময়ে সে আসেনি। তখন আকাশ ছিল কর্‌করে রোদে ভরা। কেঁদে কেঁদে পায়নি কেউ জল। এবারে সে এসেছে।

কিন্তু এত দেরী করে ?

এতদিন তবু হেঁটে-হেঁটে চেষ্টা করা চলত—অন্ততঃ ভেঙ্গে আনা চলত গাছের পাতা। এবারে তারও সুযোগ রইল না।

দুর্ভিক্ষের সাথে এসেছে জল।

জল—জল—আর জল !

দুর্ভিক্ষের সাথে নেমেছে কলস্রোত জলের বন্যা।

অনাহারে মানুষ পঙ্গু হয়ে উঠেছে একদিকে। অন্য দিক্ হতে এসেছে আবার উত্তাল জল-তরঙ্গের গভীর করাল্ রেখা।

পৃথিবী বুঝি ডুবে যায়!

আকাশ চুইয়ে-চুইয়ে অবিশ্রান্ত ধারায় নামছে টুকরো বুকের গলিত রূপ। নদীর মোহানা ডিঙ্গিয়ে, খাল-বিল ভাসিয়ে, চারদিক্ জলে জলাকার হয়ে গেল!

দুর্ভিক্ষ—বর্ষা—জলপ্লাবন।

আর—সব ঘটনাই ঘটছে চোখের পলক পড়তে না-পড়তে যেন! বিপদ্ বুঝি এমনিই আসে!

না। এমন করে মানুষ ত বাঁচতে পারে না।

—ভেসে বেড়াচ্ছে চারদিকে অগণিত মৃত মানবের শব। পোড়ান হয়নি কাউকে।

কে পোড়ায়? আজকের দিনে এ যে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব। মৃত্যুই ত সবার পরম বন্ধু!

ওদিকে দল বেঁধে আড়কাঠির লোক অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে দাসক্রয়ের ব্যবসা।

কুণাল নীল হয়ে উঠল। নিজে সে ক'দিন ধরে অনাহারে আছে—এবং অভুক্ত শায়িত তার পিতা।

পিতা তার পাচ্ছে না আহার। কুণাল কি করবে ভেবে পায় না। মাথার ভেতর তার আগুন জ্বলছে।

ওপরে কালো মেঘ-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে সে অক্ষমের আর্ত্তনাদে শুধু বলেঃ ভগবান্! দয়া কর।

খাবার কিছু সংগ্রহ করতেই হবে। যেমন করেই হোক, বাঁচাতে হবে তার পিতাকে।

কলাগাছের একটা ভেলা করে সে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু শরীর চলতে চায় না। জঠরের ভিতর যেন ক্ষুধার দাবানল জ্বলে উঠেছে!

ক্লান্ত—অবসন্ন— নির্জ্জীব। তার শরীরের প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু যেন ব্যথিত ক্রন্দনে বলছে ঃ খাবার চাই—খাবার চাই।

দু' হাতে খানিকটা জল তুলে সে মুখে পূরল।

কিন্তু—কি বিস্বাদ! মানুষের গলিত শবযাত্রায় জলরাশি পঙ্কিল হয়ে গেছে বুঝি!

খাবারের খোঁজে কত জায়গায় সে গেল! কিন্তু কই? সবারই কণ্ঠে আর্ত্তনাদ! সবারই চক্ষু দীপ্তিহীন!

ঃ এ কি অদ্ভুত মুহূর্ত্ত ভগবান্! কুণাল চীৎকার করে বলতে লাগল ঃ শক্তি দাও, হে বিধাতা, শক্তি দাও।

ধীরে-ধীরে এসে পড়লো সে এবার তপতীদের বাড়ীর কাছে। বাড়ীতে ঢুকবার সাথে সাথে কি একটা আতঙ্কে তার বুক ভরে উঠল! কি এক অশোভন উত্তাল অজানা সঙ্কোচ যেন তাকে পেয়ে বসেছে! কেমন যেন একটা ভয়!

তবে কি তপতী নেই।

তবে কি তপতীকে আড়কাঠিরা কিনে নিয়ে গেছে?

ভেলাখানি বাড়ীর দরজায় বেঁধে, চীৎকার করে কুণাল ডাকতে লাগল ঃ তপতী, তপতী !—

উত্তর নেই। সেই ফাঁকা বাড়ীর চারদিক্ থেকে শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে এল ঃ তপতী, তপতী !—

কুণাল দুই হাতে দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল।

দরজা খোলা। আর—এক কোণে এক বৃদ্ধার গলিত শবদেহ।

তার গলিত ডান-হাতের মুঠিতে কতকগুলো কাগজ।

কুণাল কাগজগুলো টেনে বের করল। কয়েকটি নোট এবং একখানা ছোট্ট চিঠি! তাতে লেখা ঃ

কুণাল-দা!

ক'দিন ধরে আমি আর মা কিছু খাইনি। তাই নিজকে বিক্রী করে দিলাম আড়কাঠিদের হাতে। কোথায় যেতে হবে জানি না। মা মৃত্যু-শয্যায়—বাঁচাবার ব্যবস্থা থাকলে করো। নইলে টাকাটা তুমি নিও। ২৫৲ টাকা। ইতি—

তপতী

কুণাল বোকার মত ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। পৃথিবী যেন তার চারপাশে চরকির মত বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে!

একবার সে তাকাল গলিত শবদেহের দিকে।

এত দুঃখেও কুণালের হাসি এল। হায় মানুষের জীবন!

একবার ইচ্ছা হলো—টাকাটা সে টুকরো-টুক্‌রো করে ফেলে দেয়! কিন্তু না। মানুষ-বেচার টাকা সবটাই তপতী দিয়ে গেল শেষ দান করে। এ অমূল্য দানকে সে নষ্ট করতে পারে না।

দুই হাতে সেই গলিত শবদেহ জলে ভাসিয়ে, সে ভেলা ছেড়ে দিল নিজের বাড়ীর দিকে।

তখন বুকে তার এক দারুণ ব্যথা—তপতী তার নেই।

তিন

শ্মশানে

কিশোর কুণাল—ঐ ত ছোট্ট একটু শিশু বই ত নয়! কিন্তু বিপদে পড়ে আজ যেন সে কেমনধারা হয়ে গেল! কোন বেদনাই যেন আর তাকে দুঃখ দিতে পারে না!

ধীরে-ধীরে ভেলা নিয়ে এল সে নিজের বাড়ী।

দরজা খোলা। কেমন একটা আতঙ্কে তার বুক ভরে উঠল। চীৎকার করে ডাকল: বাবা, বাবা!—

না—বাবা তার বাড়ী নেই।

কুণাল প্রত্যেকটি ঘর খুঁজল। কিন্তু কই তার বাবা?

অকারণে কুণালের মনে হতে লাগল যে, চোখের সম্মুখে ছেলে না-খেয়ে থাকবে, পিতা হয়ে তিনি এ-দৃশ্য দেখতে চাননি। আড়কাঠিরা হয়তো কুণালকে কেনবার জন্যে তার পিতাকে খুব সাধাসাধিও করেছিল। মানুষের মন—অভাবের তাড়নায় তাদের হয়তো কথাও দিয়েছিলেন তিনি; কিন্তু পারলেন না। পুত্র-বিক্রীর কল্পনা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে, তাই বোধহয় পালিয়েছেন!

কুণাল চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এত দুঃখের মধ্যেও তার হাসি পায়। তার ইচ্ছা হলো, চীৎকার করে গান গায়। ইচ্ছা করে তার নাচতে।

মাথার ভিতর আগুন জ্বলছে। কুণাল বুঝি পাগল হয়ে যাবে!

সত্যিই পাগলের মত কুণাল একা-একা হাসতে লাগল।

তপতী নেই—বাবা নেই—বেশ!

কুণাল উঠে দাঁড়াল! হাতের টাকাটা সে বেশ ভাল করে দেখল। এদেরও আজ কোন মূল্য নেই। কারণ,—খাবার কই? টাকা থাকলেই ত হবে না! খাবার চাই।

কুণাল হাসছে। গান গাইছে—পাগলের মত গান গাইছে।

ঃ না—এমন করে মৃত্যুকে বরণ করার মাঝে ত কোন মানে হয় না! ধীরে ধীরে ঘর হতে সে বেরিয়ে এলো। ভেলা ভাসিয়ে চলল অজানা পথের দিকে।

শক্তি নেই যে ভেলা চালায়। আপনিই হাওয়ায় ভেসে ভেলা চলতে লাগল।

এক-একটা বাড়ীর পাশ দিয়ে ভেলা যায়, আর ভেসে আসে সেখানকার কাতর ক্রন্দন।

না—কোনদিকে সে মন দেবে না।

দিলে লাভ নেই।

ভেলা ভেসে চলল।

আকাশে জল—ঘন মেঘ—বিদ্যুৎ—আর বিদ্যুতের চমক।

ওপারে সূর্য্য নেমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তার রঙ্গীন আলোয় পশ্চিম-আকাশ সোণালী মেঘের মত খুশীতে ভরপূর।

কিন্তু তবু সে ভুলতে পারে না—তপতী নেই, তার বাবা নেই।

ক্ষিদেয় নাড়ীভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে—যেন কোন্ এক শীতল স্পর্শ নেমে আসছে তার চারধারে! এই আহারের আতঙ্কে পিতা তার পালিয়ে গেছেন, আর তপতী বিক্রী করেছে নিজেকে।

তপতী নেই। তার বাবা নেই!

ভেলার ওপর কুণাল হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। কাণে আসছে তার চারদিক্ থেকে কাতর সব আর্ত্তনাদ!

একটা ভাঙ্গা টিনের বাড়ীর কাছে কিসে বেধে ভেলাটা থেমে গেল!

ভিতরে কারা যেন কথাবার্ত্তা বলছে!

কিন্তু এখানেও সেই একঘেয়ে কাহিনী! একই আলোচনা! বাড়ীশুদ্ধ লোক নাকি না-খেয়ে আছে ক'দিন ধরে। কোলের ছোট ছেলেটা—'মা, মা' করে চীৎকার করছে।

—না। কুণাল এ-সব শুনবে না। শুনে তার লাভ কি?

আবার সে ভেলা ভাসিয়ে চলল উজান বয়ে।

কিন্তু কিছু খাবার যে চাই-ই।

শুয়ে থাকতেও যেন এখন কুণালের কষ্ট হচ্ছে! 'কিন্তু এই জলময় দুর্ভিক্ষ-প্রাঙ্গণে খাবারই বা কোথায়?

আকাশে এদিকে ছড়িয়ে পড়েছে কালো থোকা-থোকা অন্ধকার। উঃ, কী ভয়ানক রাত্রি!

আগে কিন্তু কুণালের ভয় করত রাতে একা বেরুতে। আর আজ সে অনায়াসে গহিন-পথের মাঝ দিয়ে চলেছে নিঃসঙ্গ।

জলে-ভেজা পাখীগুলি গাছের ডালে বসে কাঁপছে—তাদের ক্লান্ত কণ্ঠ শোনা যায়।

রূপকথার রাজপুত্তুর বুঝি এমনি করেই অজানা দেশের সন্ধানে তার রাজকুমারীকে খুঁজতে চলতেন! কিন্তু কুণালের ঘোড়াও নেই—সঙ্গে নেই তার তলোয়ার। নেই তার রাজ-পোষাক—নেই তার অতুল ঐশ্বর্য্য। আজ যদি কেউ এসে পথের মাঝে তার কাছে কোন বকশিস্ চায়—সে কোত্থেকে দেবে মোতির মালা?

সত্যিকার জীবন যে এত কঠোর, তা কুণাল কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি। তবে কি রূপকথার সব শোনা-কাহিনীই ছেলে-ভুলানো ছড়া?

হঠাৎ কুণালের দৃষ্টি গেল—দূরে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে।'

প্রথমে সে ভাবল—হয়তো শ্মশানে কোন শবদাহ করা হচ্ছে। তারপর বুঝতে পারল যে, এ অসম্ভব।

কে কাকে দাহ করবে এই ভয়ানক দুর্য্যোগের মাঝে?

না হয়তো কোন সন্ন্যাসী সম্মুখে ধূনী জ্বেলে গভীর সাধনায় নিমগ্ন।

কাপালিকও হতে পারে, কে জানে?

রূপকথার কাহিনীতে এমনি কত রচনাই ত আছে। হয়তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে গেলে এক্ষুণি তিনি জিজ্ঞেস করবেন: কি বর চাই তোমার? আবার হয়তো ভস্মও করতে পারেন তাকে! মা-কালীর সম্মুখে নিয়ে গিয়ে বলিদান—তা-ও অসম্ভব নয়!

কুণাল শিউরে উঠল—ক্ষণেকের জন্য।

সন্ন্যাসী হোক, কাপালিক হোক—যেই হোক,—যক্ষ, রক্ষ, দানব আর মানুষ—কাউকে আজ তার ভয় নেই।

অন্ততঃ জীবিত মানুষের সন্ধান ত পাওয়া যাবে! আর সাথে সাথে হয়তো পাওয়া যাবে কিছু আহারের দ্রব্য-সামগ্রা।

আহারের নামে ওর ক্ষীণ-বল দেহ যেন আবার সবল হয়ে উঠল। সে তখনি জল-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে ভেলা ছুটিয়ে চলল অমানুষিক শক্তিতে।

এদিকে নিকষ-কালো অন্ধকারে আবার উঠেছে ঝড়। জল উত্তাল মহাসমুদ্রের মত উঠছে—দুলছে। ভেলা বুঝি ডুবেই যায়।

উঃ—কী ভয়ানক দুলছে! আর শাঁ-শাঁ করে ছুটে চলেছে তীরবেগে! ডাইনে—বাঁয়ে—সবদিকে কেবল মানুষের শব। ভেলার চার পাশে তা আটকে গেছে। যত জোরে চলা উচিত ছিল, এখন আর সে তত জোরে চলতে পারছে না।

কিন্তু ভগবান্ তার সহায়ই বা বুঝি!

কুণাল তাকিয়ে দেখল—ভেলা চলেছে সেই আগুনের দিকেই। নইলে এই স্রোতের মাঝে কেমন করেই বা সে ভেলার মুখ আর গতি উলটাতে পারত?

কিন্তু ভেলা যে আর ভাল করে চলতে পারছে না! শব-গুলিকে মাঝে-মাঝে সরিয়ে দেওয়া দরকার।

কুণাল উঠে দাঁড়াল।

ইস্—মড়কের যেন বন্যা! চারদিক্ গাদা-গাদা মৃতদেহে ভরে গেছে। কোন বয়সের কোন নর-নারীই বাদ নেই আর!

কুণাল তা সরাতে লাগল।

ঃ আহা-হা!—

কুণাল এবার হাত দিয়েছে চুলে-আঁচলে জড়ান একটি কিশোরী মেয়ের মাথায়।

তপতীর মত বয়স তার। টেনে তুলল তাকে তার ভেলার ওপর। এখনও দেহে তার পচন আরম্ভ হয়নি। যুঁইফুলের মত সমস্ত শরীরটা কি সুন্দর! শরীরটা এখনও গরম!

বেশীক্ষণ হয়তো মরেনি।

আহা!—হয়তো পাশেরই কোন বাড়ীর বাসিন্দা হবে মেয়েটি।

ইস্—পেট একেবারে খালি! না-খেয়ে মরেছে। তারপর বুঝি বন্যার জলে এসেছে ভেসে!

মেয়েটিকে সযত্নে হাতে করে, আবার সে জলে ভাসিয়ে দিল।

জলদেবতা বুঝি কোলের ওপর তাকে গ্রহণ করে নাচাতে-নাচাতে নিয়ে গেলেন কোন্ দূর-পথে!

ঃ ঐ যে এখনও মেয়েটিকে দেখা যায়। ঐ সে ভেসে যাচ্ছে।

ধীরে ধীরে এবারে সে গেল দৃষ্টির সম্মুখ হতে কোন্ দূর-দূরান্তরে, কে জানে?

চার

ক্ষুধার জ্বালা

পথ যেন আর ফুরুতেই চায় না ! দুর্যোগের রাত বুঝি এমনই কঠিন !

চারদিকে নিরবচ্ছিন্ন একটানা অন্ধকার। মাঝে-মাঝে জমাট্ মেঘের কোলে বিদ্যুতের ঝলক। কুণালের মাথায় আকাশটা বুঝি চৌচির হয়ে ভেঙ্গে পড়বে খান্‌খান্ হয়ে এখুনি !

এবারে সেই কুণালের দেখা আগুনটা যেন ধূ-ধূ করে জ্বলে উঠেছে ! সে-ও তো এসেই গেছে প্রায় তারি কাছে !

ঐ ত ! আর একটু এগোলেই !

অবশেষে এতক্ষণে কি তার দীর্ঘ পথের অবসান হলো ?

কুণালের মনে আনন্দ আর ধরে না। অন্ততঃ তাজা মানুষ সে দেখতে পাবে। গলিত শবরাশি দেখে দেখে তার দেহ-মন শিউরে উঠেছে। আর ত সে পারে না !

এতক্ষণে কুণাল দীর্ঘশ্বাস-ফেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ভেলা এসে থামল এক জঙ্গলের কাছে।

আগুনটা তখন জঙ্গলের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

চারদিকে মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং জলস্রোতের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

সেইখানে—পাড়ে একটা গাছের সাথে ভেলা বেঁধে কুণাল নামল নীচে। মাটির স্পর্শ পেয়ে স্বস্তিতে তার সারা-দেহ খুশীর হিল্লোলে ভরে উঠল।

কিন্তু—কী অন্ধকার বন! চারধারে ঝড়ে-পড়া গাছপালা। তারই মাঝ দিয়ে কুণালের পথ।

কুণাল চলতে লাগল সম্মুখে যে-দিক্ হতে আগুন দেখা যাচ্ছিল সেই দিক্ লক্ষ্য করে। গাছের ওপর বুঝি পাখীগুলি কাঁপছে! আর্ত্ত তাদের কণ্ঠ।

সর্‌সর্ করে সুমুখ দিয়ে কি যেন একটা এঁকে বেঁকে চলে গেল। বোধ হয় সাপই বা হবে!

ওদের আর দোষ কি? চারদিকের এই জলরাশির অসীম দাপটে এরা আশ্রয় নিয়েছে এসে গাছে।

কিন্তু সাপ হোক, বাঘ হোক,—কুণাল আজ ভয় করবে না কাউকেই। সে এগিয়েই চলল।

সম্মুখে রাশি রাশি আবর্জ্জনা। গাছ-পাথর, বন-বনানী, বাড়ী-ঘর—সব যেন একাকার! গাছের ওপর গাছ পড়ে আছে—তার ওপর চলছে ঝড়। সে কি মত্ত দাপাদাপি!

এবারে সে এসে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় উঠেছে।

ঐ ত সেই আগুন! লক্-লক্ করে জ্বলছে।

একটা গাছের কোণে গিয়ে কুণাল দাঁড়াল। এখান

থেকে সব-কিছু পরিষ্কার দেখা যায়। সামনেই একটা ভাঙ্গা কুটীর।

জন-দুই লোক। বেশ জোয়ান চেহারা। কালো তাদের দেহবর্ণ। কি যেন পুড়িয়ে খাচ্ছে!

কতদিন খায়নি—এমনি ভাবে কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। চিবুবারও অবসর নেই—গিলছে তারা।

কুণালের জিভে জল এসে গেল।

দু'জন লোকের মাঝে একজন মস্ত লম্বা। আর একজন একটু বেঁটে।

মস্ত লম্বা লোকটি বলছে: এমনি করে আর ক'দিনই বা চলবে?

বেঁটে ম্লানহাসি হাসল শুধু। তারপর সে খাওয়া ফেলে এগিয়ে গিয়ে, একটা বাঁশ দিয়ে আগুনে কিসের মধ্যে খোঁচা দিতে আরম্ভ করল।

লম্বা বলছে: আর কত দেরী রে?

বেঁটে বলল: হয়ে গেল বলে। যা জল হচ্ছে, আগুন নিভে-নিভে যাচ্ছে তাই।

লম্বা বললে: আর পারিনে।

কুণাল ভাঙ্গা কুঁড়ে-ঘরটায় ঢুকল। একপাশে কতকগুলি বর্শা, আরো সব নানা-ধরণের হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র।

কুণাল বুঝলে—এটা ডাকাতের আস্তানা। দলের আর সবাই না-খেয়ে মরেছে, কেবল বাকি ঐ দু'জন।

কুণালের দৃষ্টি গেল এবারে অন্য কোণে। বিদ্যুতের আলোকে চক্‌চক্ করছে কয়েকটি মুদ্রা।

তাও ত বেশী নেই। একশ' দেড়শ'র বেশী হবে না হয়তো। হয়তো অভাবের তাড়নায়—এক মুঠি আহারের বিনিময়ে ওরা ঢেলে দিয়েছে শত শত মোহর! এমনি করে হয়তো সবই ফুরিয়ে গেছে ওদের সঞ্চিত লুঠের ধন। কিন্তু এই অর্থ এখন ঐ ডাকাত দু'জনের কাছে যেমন অর্থহীন—কুণালের কাছেও তাই।

মানুষ-বেচা টাকার এখনও ত পাঁচিশটে তার রয়েছে! কিন্তু এমন দুরন্ত প্রয়োজনেও কোন কাজেই আসছে না সে অর্থ!

কুণাল বাইরে এসে দাঁড়াল।

ওদিকে লোক দুটি আগুন হতে সেঁকা এক চারপেয়ে জন্তু টেনে বের করল। হয়ত পাঁঠা-ছাগল বা অমনি কিছু-একটা হবে।

হ্যাঁ—তাই। ক্ষুধার তাড়নায় একটা পাঁঠাকেই পুড়িয়ে খাচ্ছে শিক-কাবাবের মত করে।

একটুও সবুর সইছে না ওদের!

সেই আধপোড়া তপ্ত মাংসই দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে খাবে এক্ষুণি। এমনি তাদের রাক্ষসী ক্ষুধা!

সম্মুখে আহার্য্য—ক্ষুধার্ত্ত কুণাল—তারও জিভে জল এলো। কুণাল মুহূর্ত্তে সব ভুলে চলল সেদিকে।

পায়ের শব্দে লোক দুটি চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখল একটি কিশোর বালক।

বেঁটে লোকটা তাকে মারবার জন্যে একটা বল্লম তুলে ধরল।

কুণাল সরে দাঁড়াল।

কিন্তু লম্বা লোকটা বেঁটেকে বাধা দিল: এই থাম্।

তারপর বলল: তুমি কে?

কুণাল হেসে বলল: তোমাদেরই মত মানুষ। নিরাশ্রয়ী, অনাহারী।

লম্বা বলল: কতদিন হতে খাওনি?

কুণাল হাসল: তা মনে নেই।

লম্বা কি ভাবল একটু। তারপর সেই মাংস হতে আধখানা ছিঁড়ে দিল সেই বেঁটেকে। বলল: নে তোর ভাগ।

এরপর কুণালের দিকে তাকিয়ে বলল: এসো তুমি এদিকে।

কুণাল গিয়ে সামনে দাঁড়াল।

: নাও—খাও। যতটা তোমার ইচ্ছে।

বেঁটে বলল: সর্দ্দার!

লম্বা বলল: চুপ—

কুণাল টেনে বের করলে, কয়েকটি নোট। ও একখানা চিঠি।

—১৭ পৃষ্ঠা

কুণালের ভাববার অবসর নেই। সে মুহূর্ত্তে ছুটে গিয়ে সেই অর্দ্ধসিদ্ধ মাংসপিণ্ড নিয়ে মুখে তুলেছে।

আঃ—কী অমৃত!

বেঁটে বলল: সর্দ্দার, তুমিও ত কতদিন অনাহারে—

সর্দ্দার ম্লানহাসি হেসে বলল: দেখছিসনে ছেলেমানুষ! আর কেমন সাহসী! ও রে আমার দিন ত হয়ে এসেছে। ওর বয়স অল্প—বাঁচুক ও।

বেঁটে কি ভাবল। বলল: এসো, আমারটাও নাও। সবাই মিলে, এসো ভাল করে পেট ভরে খাই।

খেতে খেতে গল্প চলল।

লম্বা বলল: সমস্ত জীবনই ত এই ডাকাতি করে কাটল। কিন্তু কি ফল হল? পাপের শাস্তি ভগবান্ আমাকে আজ কঠিন ভাবেই দিলেন।

বেঁটে একটু দমে গেছে। সে বলল: জীবনে অর্থ ত কম উপার্জ্জন হয়নি আমাদের। রইল না কিন্তু কিছুই!

দু'জনে চুপ করে রইল। ওরা ভাবছে তাদের সমস্ত গত জীবনের কথা। আজ বুঝি দুঃখে পড়ে ভুল তাদের ভেঙ্গেছে। এমনি করেই বুঝি অভিজ্ঞতায় মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পারে!

কিন্তু কোন্ অপরাধে কুণালের এ-অবস্থা? তা সে ভেবে পায় না।

তপতী কেন নিজেকে বিক্রী করল ? কার অভিশাপে ? পিতাই বা পলায়িত কেন ? কুণাল তা-ও ভেবে পায় না।

সে একটু হাসল। তার জীবনে আজ কঠিন সত্য বীভৎস রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

স্বপ্নে-বোনা রূপকথার কাহিনী আজ কোথায় গেল তার ?

কোথায় তার রাজপুত্তুরের সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া ? কোথায়ই বা সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর বাসস্থান, আর কোথায়ই বা সাত-সমুদ্দুর তের-নদীর পাড়ের ঘুমন্ত রাজপুরী ? আর কোথায় বা সেই ধূ-ধূ তেপান্তরের পারে—সেই বিজন বনে রাক্ষস-রাক্ষসীর আবাস-ভূমি ?

কুণাল আহার শেষ করে উঠল।

লম্বা বলল ঃ কয়েকটা টাকা আছে, নেবে তুমি ?

সে হেসে বলল ঃ না।

তারপর ধীরে-ধীরে চলল তার ভেলার সন্ধানে।

এদিকে ভোরের আকাশে সোণালী রোদের ক্ষীণ আভা ছড়িয়ে পড়েছে—পূর্ব্ব-পথে। ভোরের হাওয়ায় তখন ফুটে উঠেছে ঘুমের গান !

ভেলা খুঁজে যখন কুণাল তাতে উঠল, তখন তার চোখ দুটি ঘুমের আবেশে ভরে এসেছে।

সে ভেলা ছেড়ে, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

পাঁচ

স্বর্গের ছবি

ক'দিন কাটল, সে জানে না।

ঘুম ভাঙ্গল কার যেন স্পর্শে!

চোখ খুলে তাকিয়ে সে দেখল, সম্মুখে তার দুটি যুবক। সন্ন্যাসী তারা নয়—রামকৃষ্ণ-মিশনের সেবক।

বড়জন বললেন ঃ কোত্থেকে আসছ তুমি ভাই?

কুণাল বলল ঃ আমার গাঁ কুমারী-নদীর কোলে।

ছোটটি গম্ভীর হলো ঃ সেখানকার সবাই ত বন্যায় আর দুর্ভিক্ষে ভেসে গেছে। আমরা গিয়ে সে-সব গ্রামের চিহ্নও দেখতে পাইনি।

কুণাল চুপ করে রইল।

বড়জন বললেন ঃ কিন্তু বেশীক্ষণ এখানে কাটিয়ে লাভ নেই। তুমি উঠে এসো ভাই আমাদের নৌকোয়। খাওনি বুঝি ক'দিন?

সে চুপ করে রইল।

যুবক দুটি তাকে ধরে, সযত্নে নৌকোয় তুলল—পাটাতন খুলে বের করল ফ্লাস্কে-ভরা গরম দুধ।

বলল ঃ খাও ভাই!

এবারে নৌকো ছেড়ে দিয়েছে।

বড় যুবকটি বললেন ঃ কত হাজারে-হাজারে মরেছে, কিছুই ত আমরা করতে পারলাম না। আগে যদি সংবাদ পাওয়া যেত!

নৌকো চলেছে তর্‌তর্‌ করে। নদীর বুক শান্ত। ঝড় থেমে গেছে। ক'দিন কুণাল ঘুমিয়ে ছিল—সে নিজেই তা জানে না!

নৌকো এসে থামল এক বন্দরের ধারে।

চারদিকে হাট-বাজার—লোকজন।

কুণাল বলল ঃ কোন্‌ জায়গা এটা?

বড়জন বললেন ঃ বিষ্ণুপুর বন্দর।

অবাক্‌ হয়ে সে ভাবল, বিষ্ণুপুর যে তাদের বাড়ী হতে কত দূরে! ক'দিন তাহলে ভেলায় সে ছিল?

নৌকো বেঁধে কুণালকে সঙ্গে করে তারা হাজির হলো রামকৃষ্ণ-আশ্রমে।

প্রৌঢ়-বয়সী মুণ্ডিত-মস্তক, পায়ে জুতো, গায়ে খদ্দরের দড়ি দিয়ে বাঁধা পাঞ্জাবী, এক ভদ্রলোক পায়চারী করছিলেন।

এদের দেখেই তিনি এগিয়ে এলেন।

বললেন ঃ খবর কি সব? তাকালেন কুণালের দিকে।

বড়জন বললেন ঃ প্রভু! সমস্ত নদী খুঁজেও আজ শুধু একজনকেই উদ্ধার করতে পারলাম। দক্ষিণের কোন গ্রামের চিহ্নই নেই। চারদিকে শুধু জল—আর জল ঃ

তারপর কুণালের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ ইনি আশ্রমের কর্ত্তা স্বামীজি। ওঁকে প্রণাম কর।

কুণাল প্রণাম করল।

ভক্তির উৎস যেন স্বামীজি! দেহে-মনে একটা অসাধারণ সারল্য।

হাত দিয়ে উঠিয়ে কুণালকে বুকের কাছে তিনি তুলে নিলেন। বললেন ঃ খেয়েছ কিছু?

এতো আদর কত কাল সে পায়নি!

মাথা নেড়ে জানাল—হ্যাঁ!

ছেলে দুটি ওদিকে চলে গেছে।

গাছতলায় একটি বেঞ্চে দু'জন এসে বসলেন।

স্বামীজি ধীরে-ধীরে কুণালের কাছ হতে জানলেন তার ইতিহাস।

তিনি কিছুক্ষণের জন্য গম্ভীর হলেন। তারপর ধীরে-ধীরে বললেন ঃ এখন কি করতে চাও তুমি? আমায় বল।

কুণাল ভাবতে লাগল।

স্বামীজি বলে চললেনঃ ইচ্ছা হয়তো এখানে থেকে মানুষের সেবা করতে পার। মানুষের সেবাই সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম।

কুণাল স্বামীজির পায়ের ধূলো নিল। বলল ঃ স্বামীজি!

ঃ কি-বল।

ঃ আমার আকাঙ্ক্ষা ॥ কুণাল কুণ্ঠিত ভাবে বলতে লাগল ঃ আমার আকাঙ্ক্ষা বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি নয়। আমি বাঁচতে চাই।

গম্ভীর ভাবে স্বামীজি বললেন ঃ কি করতে চাও তুমি?

কুণাল মাটির দিকে তাকিয়ে বলল ঃ আমি আগে মানুষ হয়ে উঠতে চাই—সংসারীর মত, গৃহীর মত।

নীরবে স্বামীজি কিছুক্ষণ পায়চারী করলেন এদিক্-ওদিক্।

তারপর বললেন ঃ উত্তম। সবাইকে যে আশ্রমে আসতে হবে তা নয়। গৃহী না-থাকলে আশ্রমের অর্থও হয় না।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন ঃ তোমার মত ছেলে যদি বড় হয়ে দেশের জন্য কাজ করে, তবেই দেশ ও জাতির মঙ্গল। আমি তোমাকে আটকে রাখব না। কালই তুমি কলকাতায় চলে যাও। আমি চিঠি দিয়ে দোব।

কুণাল স্বামীজির পায়ের ধূলো নিলে।

পৃথিবী যেন আজ মধুর! আজ তার সব-কিছু সুন্দর ও সজীব! তার সারা-গায়ে আজ যেন স্বর্গের ছবি।

ঃ

সমস্ত রাত সেদিন আর তার ঘুম হলো না। স্মৃতির চারদিকে ঘিরে এসেছে তার বাল্যের কথা। পিতা তাকে দিয়ে

কত আশা করেছিলেন! আজকে এসেছে সে সুযোগ। হয়তো মানুষ হতে পারবে সে জীবনে, কিন্তু বাবা তো আর কোনদিন দেখতে আসবেন না! কে জানে, তিনি এখনো বেঁচে আছেন কিনা!

মায়ের কথা তার মনে পড়ে।

আব্ছা-আব্ছা—একটু-একটু করে মনে হয়, যেন তার মা তাকে কোলে করে আছেন!

আর মনে হয় তপতীকে।

রাতের আকাশ ওদিকে তারার তারাময় হয়ে ওঠে। সুন্দর পৃথিবী লাবণ্যে হেসে ওঠে মধুর ভঙ্গিতে।

আশ্রম এখন নির্জ্জন। সেবকের দল সবাই পড়েছে ঘুমিয়ে।

শুধু স্বামীজির ঘরে জ্বলছে আলো—হয়তো তিনি পাঠে নিমগ্ন।

মনে-মনে কুণাল স্বামীজিকে প্রণাম করল।

ছয়
সোণার পরশ

স্বামীজির চিঠি নিয়ে কলকাতায় এসে কুণাল দেখা করল প্রকাণ্ড এক ব্যবসায়ীর সাথে।

আশ্চর্য্য !

সেই ভদ্রলোক স্বামীজির পত্র পাঠ করে একটি কথাও কুণালকে জিজ্ঞাসা করলেন না। শুধু বললেন ঃ তুমি এখানেই থাকবে—আমার কাছে।

এত বড় ব্যবসায়ী কিন্তু সাদা-সিধে চাল-চলন। অপব্যয় নেই তাঁর একটি পয়সা—আছে বৃহৎ ও মহত্তর দানের আগ্রহ।

কুণাল সেইখানেই রয়ে গেল।

কী চমৎকার মিঠে এঁদের ব্যবহার !

ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে সে 'কাকাবাবু' বলে ডাকে। তাঁর স্ত্রীকে ডাকে 'কাকিমা' বলে।

কাকিমা আদর করে কত কথা জিজ্ঞেস করেন !

তার ছোট্ট মেয়ে সুস্মিতা বলে ঃ কুণাল-দা, সেই গল্প বলতে হবে কিন্তু—রাজপুত্তুরের তেপান্তরের গল্প।

কুণাল জবাব দেয় ঃ রাজপুত্তুর হারিয়ে গেছে।

শ্রিতা রাগ করেঃ তাই না, আরো কিছু! বলোনা কি হলো তারপর!

এমনি করে সুখে-দুঃখে দিন কাটে।

তপতীর কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। পিতাকেও সে ভুলতে পারেনি।

বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়—এক শুভ দিনে সে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করল।

তার কাকাবাবু বললেনঃ কি করতে চাও এবার?

কুণাল বলেঃ আপনি যা বলবেন।

কাকাবাবু একটু চুপ করে থেকে বলেনঃ তোমার ইচ্ছা হয় তুমি পড়তে পার। তবে—

কুণাল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকায়।

কাকাবাবু বলে চলেনঃ বর্ত্তমান কালে অতিরিক্ত শিক্ষার প্রয়োজন সবার জন্যে নয়। তোমার মত বুদ্ধিমান্ ছেলে যদি ব্যবসায়ে নামে, তাহলেই দেশের মঙ্গল হতে পারে বেশী।

কুণাল ভাবতে লাগল।

কাকাবাবু বলে চললেনঃ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। তুমি ভেবে দেখ। আই-এ পড়ে কি করবেই বা শেষে? তার চেয়ে এখন যদি ব্যবসায়ে নাম, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহলে উন্নতি

অনিবার্য্য। আর তোমার মনে যখন বহুলোকের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা—এই পথই তোমার শ্রেয়।

কাকাবাবু চুপ করলেন।

তারপর বললেন ঃ দু'-একদিন ভাবো। তারপর আমায় জানিয়ো।

কুণাল আস্তে-আস্তে বলল ঃ কিন্তু ব্যবসায়ে ত মূলধন দরকার।

কাকাবাবু হাসলেন। বললেন ঃ সে ভাবনা আমার।

কয়েকদিন কাটল।

একবার ইচ্ছা করে পড়াশুনা করে। তারপর ভাবে, কিন্তু কি হবে তা দিয়ে?

সুশ্রিতা এসে বলে ঃ রোজ কি ভাবো তুমি এত কুণাল-দা?

সে হাসে। বলে ঃ কত-কিছু!

সুশ্রিতা বেণী দোলাতে-দোলাতে কুণাল-দার গলা জড়িয়ে ধরে।

সে বলেঃ রাজপুত্তুর হারিয়ে গেল, তারপরে কি হলো তার?

কুণাল হেসে বলে ঃ তারপর আর কিছুই নেই।

ঃ ইস্ * সুশ্রিতা বলেঃ কখ্খনো নয়। তোমার সব বানানো।

সুস্মিতা ওর ছোট বোন। কুণালের বোন নেই, ওকেই সে বোনের মত করে পেয়েছে যেন!

কুণাল অবশেষে কাকাবাবুকে বলল: আমি ব্যবসাই করব।

কাকাবাবু হেসে বললেন: ভাল কথা। কিন্তু ব্যবসায়ে প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী কি জানো?

কুণাল মুখ তুলে তাকায়।

কাকাবাবু বলেন: নিরহঙ্কার, পরিশ্রমী এবং সত্যবাদী হতে হবে। কোন দিন কোন অসতর্ক মুহূর্তেও এ-পথ হতে বিচ্যুত হলে চলবে না।

সে বলল: আমি পারব কাকাবাবু।

কাকাবাবু তাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন: আমি জানি।

তারপর বললেন: কাল হতে তুমি আমার সাথে বেরুবে। এখন কিছুই তোমাকে করতে হবে না। এখন শুধু দেখে যাবে ব্যবসায়ের চারদিক্। তারপর যখন বুঝব তুমি উপযুক্ত হয়েছ, তখন হাতে-কলমে কাজ করবে।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

তারপর বললেন: ব্যবসায়-শেখাও একদিনে হয় না। দীর্ঘদিন শিখতে হয়। তাই হয় না বলেই বাঙ্গালী ব্যবসায়ে দাঁড়াতে পারছে না। আমার মনে হয়, তুমি পারবে।

কুণাল তার পায়ের ধূলো নিল।

কাকাবাবু বললেনঃ তোমার কল্যাণ হোক।

পরদিন হতে সে বেরুতে আরম্ভ করল তার কাকাবাবুর সাথে।

যতই সে তার কাকাবাবুকে দেখে, ততই অবাক্ হয়। কী সহনশীল, এবং কী প্রচণ্ড ধৈর্য্য! কোন অবস্থাতেই চঞ্চল নন। এমনি করেই তিনি করেছেন বড়-বড় জুট-মিল, কটন-মিল। আরো কত টাকা যে কতদিকে খাটছে, ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কোন সময়ে কিছুমাত্র অহঙ্কার ও অধৈর্য্য তাঁকে চঞ্চল করতে পারে না।

দিনের পর দিন এমনি করে চলে।

গ্রীষ্ম আসে তার দাহন নিয়ে; বর্ষায় নেমে আসে ধারা; শরতে ভরে ওঠে পৃথিবী কূলে-কূলে; হেমন্তের বুকে জাগে কচি পাতায় নব-দূর্ব্বার শিশিরের মুক্তাবিন্দু; তারপর শীতের কুহেলী-তুহিন স্পর্শের অন্তে আবার বসন্ত আসে ঘুরে। ঋতুর পর ঋতু-আবর্ত্তন এইভাবে রূপ-রসে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তারই সঙ্গে অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতায় কুণালও ব্যবসায়ে পাকা হতে লাগল। সে শিখে ফেলেছে বিপদের দিনে কি

করে রক্ষা করতে হয় সব দিক, এবং সুখের দিনে কি করে করতে হয় মূলধনের সুব্যবহার।

কাকাবাবু এখন মাঝে-মাঝে একেই সমস্ত দেখতে-শুনতে পাঠান। কুণালের ওপর তাঁর বিশ্বাস এসে গেছে অগাধ, এসেছে নির্ভরতা অটুট।

কুণালের এখন আর সময় নেই। প্রতিটি মুহূর্ত্ত এখন তার মহার্ঘ।

সুশ্রিতা তবু গল্প শুনতে চায়। কিন্তু সমস্ত গল্পই যে সে এখন ভুলে গেছে! এখন আর কল্পনা নয়, এখন শুধু বাস্তব।

বাস্তবের কাছে সেই কাল্পনিক নির্জ্জন পুরীর রাজকন্যার প্রবেশ-পথ এখন অর্গল-বন্ধ। সেই স্বপ্নে-বোনা কাজল-কুমারী, দুধে-আলতা রংয়ের কুচবরণ কন্যা, মেঘবরণ-চুল রাজার মেয়ে যেন কত দূরে হারিয়ে গেছে!

কোথায়—কোথায় তারা আজ?

কুণাল মাঝে-মাঝে ভাবে—ঠাকুরমার কোলে শুয়ে-শুয়ে যে-সব গল্প সে শুনত, কোথায় তারা? কোন্ রত্নপুরীর হীরার খাটে রূপোর কাঠির পরশে কাঞ্চনমালা তার সাত সখী নিয়ে ঘুমিয়ে আছে? ঘুম কি তাদের ভাঙ্গবে না? কোথাকার কোন্ রাজপুত্তুর এসে, কখন কোন্ শুভলগ্নে সোনার কাঠির

পরশ ছুঁইয়ে আন্‌বে চেতনার স্ফুরণ? হেসে, জেগে উঠে রাজকন্যা তাকাবে মিলনের মধুর দৃষ্টিতে সেই বিস্মিত মুগ্ধ রাজপুত্তুরের মুখের দিকে!

এ-সব রঙ্গীন ছবি তার কোথায় গেল?

এখনো মাঝে-মাঝে তপতীকে তার মনে পড়ে—আর মনে পড়ে তার বাবাকে।

চীৎকার করে সে বলে ওঠে: ঈশ্বর! মুখ তোল। ফিরিয়ে দাও—সব আমার ফিরিয়ে দাও। মুখ তুলে তাকাও দয়াময়!

সত্যি, মুখ তুলে তাকালেন বিধাতা। বিধাতাই তাকালেন কিনা জানিনে, কিন্তু মানুষের পুরুষকারের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে-শক্তি—তাকেই হয়ত আমরা নাম দিয়েছি 'বিধাতা'। তিনিই মুখ তুলে তাকিয়েছেন এবার।

কাকাবাবু সেদিন কি একটা কাজে সহরের বাইরে গিয়েছিলেন। রাতে এলেন।

কুণালকে ডেকে বললেন ঃ কুণাল, তোমার কথাই ঠিক।

কুণাল কিছু বুঝতে পারল না।

কাকাবাবু টেবিলের ওপর সাত হাজার টাকার নোট রাখতে-রাখতে বললেন ঃ তোমার কথামত পাট আর তূলো কিনে এ-মাসে এ-টাকা বেশী লাভ হয়েছে। এ তোমার কুণাল!

কুণাল কুণ্ঠায় যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। কি বলবে, বুঝতে পারল না।

তবু বললঃ আপনি আমাকে আহার দিয়েছেন, পড়িয়েছেন,—এ লজ্জা হতে আমাকে রক্ষা করুন।

কাকাবাবু হাসলেন ঃ তা হয় না। এ-টাকাই তোমার মূলধন হোক।

তারপর বললেন : আজ আমার পরম আনন্দ যে, তুমি উপযুক্ত হয়ে উঠেছ। স্বামীজি তোমাকে পাঠিয়েছেন ; তিনি মানুষ না-চিনে পাঠাননি।

একটু চুপ করে বললেন : জানো স্বামীজি কে ?

কুণাল আগ্রহের সাথে তাকাল।

কাকাবাবু বলে চললেন : দুজনে আমরা সহপাঠী। বহুদিন একসাথে পড়েছি। বিলাতে গেলাম দু'জনেই একসাথে। নির্ম্মল হয়ে এল আই-সি-এস, আমি পাশ করে এলাম ব্যারিষ্টারী। বিরাট জমিদারী ওর শেষে ও দান করল বিবেকানন্দের নামে।

কাকাবাবু চুপ করলেন। হয়তো এতটা জানানোও তাঁর ইচ্ছা ছিল না।

কুণাল স্তম্ভিত ও মুগ্ধ ! তার চারদিকে কারা যেন কথা কয়ে উঠেছে গানে আর ছন্দে ! জীবনের প্রতিটি রেখাও যেন আজ সজীব ও সুন্দর !

কুণাল ভাবে : আকাশে কত তারা !

ঐ যে ধ্রুব আর স্বাতি-নক্ষত্র। ধ্রুব-তারাকেই না শুকতারা বলে ?

শুকতারাটা বুঝি ভোরে ওঠে ! তারও জীবনের ভোর হবে কবে ? আর কবে উঠবে তার ধ্রুব-তারা—তার তপতী ?

কুণালের শুধু মনে হয়—আঁধার রাত ধীরে-ধীরে যেন কেটে যাচ্ছে! চারদিকে কেবল আলো—বাতাস—সুর আর ছন্দ!

সুন্দর পৃথিবী।

কুণাল আবৃত্তি করতে লাগল ঃ

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি,
সে আমার নয়।
যে মুক্তি গোপনে রাজে
অসংখ্য বন্ধন মাঝে,
তারি তরে হ'ল মোর
ব্যাকুল হৃদয়!

বিশ্রাম নেই—অবসর নেই। কর্ম্মব্যস্ত কুণাল সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত্তকে কাজে নিয়োজিত করেছে।

সুশ্রিতা তার অবসরের সাথী।

এর সাথে মনে পড়ে যায় তার হারানো দিনগুলির কথা।

গ্রামের কথা মনে আসে। নদীর কোল ঘেঁসে তাদের সেই ভাঙ্গা কুঁড়েখানি হয়তো রাক্ষসী নদী নিয়ে গেছে দূর-দূরান্তে! জন-মানবের বসতি হয়তো উঠে গেছে সেখান থেকে! কে জানে?

আঁকা-বাঁকা সেই গ্রামের পথ। গ্রামের পুকুর। সেখানকার মাধবী-লতার কুঞ্জতল—শিউলি-ফুলের মালা-গাঁথা সব-কিছু মনে আসে।

ভোরের পাখীর সেই মিষ্টি গান—কি মিষ্টিই যে ছিল !

সুশ্রিতা বলে ঃ তারপর কি হলো কুণাল-দা ? এতদিন না-খেয়ে ছিলে কি করে ?

কুণাল হাসে।

সুশ্রিতা বলে ঃ বা, বেশ ডাকাত ত ! কিছু বললে না !

কুণাল বলে ঃ নারে, কিছুই বলেনি। তারাও যে মানুষ। জানিস, ওদেরও দয়ামায়া আছে !

সুশ্রিতা বলে ঃ ইস্—ডাকাত, ডাকাতই। আচ্ছা, তোমাদের জমিদার এমন খারাপ কেন ? তারও ত সবই গেল। প্রজাই যদি রইল না, তাহলে কি করবে সে তখন জমি-জমিদারী দিয়ে ?

কুণালের ইচ্ছা করে বলে যে, এ-বিবেচনা থাকলে এমন সোণার গ্রাম এ-ভাবে নষ্ট হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যেত না।

সত্যিই জমিদার বিপিন মুন্সীকে সে ভুলতে পারে না। অর্থ তার কাছে এতই প্রিয় যে, প্রজাদের ভাসিয়ে দিল জলে ! কিন্তু কই—স্বামীজিও ত জমিদার ছিলেন ! তিনি ত দান করলেন জাতিকে !

কুণাল বলল ঃ সব কিন্তু সমান নয় রে ! বড় যাঁরা, যাঁরা অর্থে এবং সামর্থ্যে বড়, তাঁরাই ত যুগে-যুগে জগতের দীন-দরিদ্রের দুঃখও মোচন করেন।

সুশ্রিতা এ-সব বুঝতে চায় না। বলে ঃ যাকগে ও-সব। তপতী-দি'র কি হলো—বললে না ?

বোবা-কণ্ঠে কুণাল চুপ করে থাকে।

তারপর বলে ঃ মানুষ-বেচার টাকা এখনো আমার কাছেই আছে। কি করি বল ত ?

সুশ্রিতা বলে ঃ আমি কি জানি ?

কুণাল বসে-বসে কি যেন ভাবে !

ব্যবসার নামে কাকাবাবুর কাছ থেকে পাওয়া সাত হাজার টাকা এবং তার সাথে পঁচিশটে টাকা যোগ করে পরের দিনই সে পাঠিয়ে দিল স্বামীজির কাছে।

ছোট্ট একটা চিঠি পাঠাল সেই টাকার সাথে ঃ

স্বামীজি,

কয়েকটা টাকা পাঠাইলাম। যা ইচ্ছা করবেন।

ইতি—কুণাল

আজ যেন একটু হালকা লাগছে নিজকে ! বহুজনের মঙ্গলের জন্য অন্ততঃ কিছু ত সে করতে পারল ! তার পক্ষে এই বা কম কি ? এমনি করে সবাই মিলে যদি মানবের মঙ্গলের জন্য কিছু করে, পথ তাহলে কত সোজা হয়ে যায় !

এই সব কথা কুণাল ভাবে।

এমনি করে দিন চলে। কিন্তু তবু তপতীর কথা মনে হয়।

মনে হয়, একটি মেয়ে কোঁচড়ে করে জাম নিয়ে এসে যেন দাঁড়িয়েছে তার কাছে।

হায় রে! কোথায় সেদিন?

তার বাবাই বা কোথায়?

আজ তিনি থাকলে কত সুখী হতেন! বড় সে হলো। কিন্তু যাঁর সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল ছেলেকে বড় দেখবার জন্য —তিনিই আজ নিখোঁজ! তবু কেন যেন মনে হয়, বাবা তাঁর মরেননি। হয়তো তপতীও মানুষের ভীড়ে কোথাও লুকিয়ে আছে!

এত আনন্দের মধ্যেও তাই ওর দুঃখ।

বসে-বসে তাই সে ভাবছিল।

কাকাবাবু এমন সময় প্রবেশ করলেন ঘরে। তিনি কোন কথা না-বলে এসে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলেন কুণালকে। বললেন ঃ এই দেখ, স্বামীজি লিখেছেন চিঠি।

লজ্জিত হয়ে কুণাল পড়ে চলল।

কাকাবাবুর কাছে স্বামীজি লিখেছেন ঃ

> ······সে যে সব্যসাচীর মত উন্নত এবং ভুল করে যে তোমার আশ্রয়ে তাকে পাঠাইনি, এই হলো সবচেয়ে আমার আনন্দের কথা। কুণালকে আমার কল্যাণ জানিও।······

আনন্দে চোখ বেয়ে কুণালের অশ্রু গড়িয়ে গেল।

কাকাবাবু দুই হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঃ আজ হতে তুমি আমার সমস্ত ব্যবসায়ের অংশীদার।

কুণাল বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

জীবনে যা সে কল্পনাও করতে পারেনি, আজ তাই হয়ে গেল তার! কিন্তু কি যেন এখনো বাকি!

কুণাল বলল ঃ আমি কিছুদিনের ছুটি চাই কাকাবাবু!

কাকাবাবু বললেন ঃ কেন ?

কুণাল ঃ এবার বাবাকে খুঁজে আনি।

কাকাবাবু বললেন ঃ নিশ্চয়ই। তুমি কালই চলে যাও। মনে রেখ, তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং তাঁকে খুঁজতে বেরিয়ে অর্থের কার্পণ্য করো না।

সুশ্রিতা ছিল কাছেই। বলল ঃ তপতী-দি'র কথাও ভুলো না কিন্তু।

কুণাল বলল ঃ চুপ্ কর।

সুশ্রিতা বলল ঃ বেশ।···ধীরে-ধীরে সে চলে গেল।

কুণাল ভাবতে লাগল যে, রাজার কুমার যেন এবারে পক্ষী-রাজ ঘোড়ায় চেপে চলবে তেপান্তরের সীমানায়! রাজকুমারী বন্দা হয়ে আছেন লৌহপুরে। তাকে মুক্ত করে আনতে হবে।

সুশ্রিতা আবার এসেছে। বলল ঃ খুঁজে পাওয়া মাত্রই তপতী-দি আর জ্যাঠামশাইকে নিয়ে আসবে কিন্তু। আর দেখ 'ভাই-ফোঁটা'র দিনের আগেই এসো—আমি বসে থাকব তোমার জন্যে।

কুণাল তার ছোট বোনটির দিকে তাকিয়ে রইল। কি সরল এই সুশ্রিতা! সব সময়ই হাসিমুখ। লম্বা একটা বেণী।

হ্যাঁ—এবারে কুণালকে যেতেই হবে ওদের খুঁজতে। যেমন করেই হোক, বার করতেই হবে। নতুবা সব যে মিথ্যা হয়ে উঠবে!

কি হবে তার আজকার এত ঐশ্বর্য্য দিয়ে যদি তাদেরই না মিলল? দাস-বিক্রীর অর্থ দিয়েও যে মেয়ে তাকে শেষ দান দিয়ে গেছে, তার সেই বাল্যবন্ধু তপতীকে সে ভুলবে কেমন করে?

আকাশে আজ কী আলো! চাঁদ তার রূপালী জোছনায় চারদিক্ যেন উজাড় করে ছেয়ে গেছে! থোকা-থোকা জোছনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে সকল-কিছুর মধ্যে।

দূরের ঐ মন্দিরের চূড়োটাও সে-আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়।

আট
ভাইফোঁটা

অন্বেষণ আরম্ভ হলো।

কয়লা-কুঠীর প্রতিটি মানুষ সে দেখল। কিন্তু তপতী কই?

কই তার তপতী?

ভ্যানে করে কয়লা বোঝাই হয়ে যাচ্ছে—ট্রেন চলছে হু-হু করে। মাটির নীচে বিরাট কল-কারখানা। বোমা দিয়ে ফাটান হচ্ছে কয়লার স্তর। আগুনের ফুলকি উঠছে চারদিক্ কেঁপে-কেঁপে। কুলিরা হাঁকছে—সাবধান সব।

মেশিন চলে। কয়লার জ্বলতে থাকে।

দড়ির লিফ্‌ট্ বেয়ে-বেয়ে হাতবাতি নিয়ে কুলি-মজুরের দল নামতে থাকে নীচে। গাড়ী বোঝাই হয়।

সহরে চালান চলে যায়।

কুলিগুলি কী খাট্‌তেই পারে! সাঁওতাল কুলির দল। তাদের সাথে রমণীরাও কাজ করছে। কালো চেহারা। মন সাদা!

দূরে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি মেয়েকে কুণাল লক্ষ্য করে।

কিন্তু কই তার তপতী?

খুঁজে খুঁজে কুণাল হয়রান।

প্রত্যেকটি কয়লার কারখানা খোঁজা হলো—তবু সন্ধান মিলল না।

সর্দ্দারদের ডেকে-ডেকে কুণাল বলেঃ চেন সর্দ্দার, তপতী বলে কোন মেয়েকে চেন ?

সর্দ্দার বলে—কৈ তাপ্তি বলে ত কোই নেই হ্যায়।

কুণাল বলেঃ তাপ্তি নয় তপতী। বাঙ্গালী।

সর্দ্দার বলে—নেহি জী। বাঙ্গালী কোই নেই হ্যায়। চা-বাগানমে মিলতে পারে। আড়কাঠি লোগ লে-আয়া—তব চা-বাগানমে মিল্ জায়েগা।

কয়লার খনির কোন ম্যানেজারও তপতীর সংবাদ দিতে পারল না। সবাই বলে—চা-বাগান।

কিন্তু কই চা-বাগানেই বা কই ?

ঐ ত মেয়েরা চায়ের পাতা তুলছে—তাদের ভিতর তপতী ত নেই ! ঐ ত চা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়ের দল—সেখানেও ত তপতী নেই।

সবুজ চায়ের গাছে সমস্ত প্রান্তর পরিপূর্ণ।

অধিকাংশই মেয়ে-মজুরের দল।

কুণাল খুঁজতে লাগল। কত রকমের কত মেয়ে—কিন্তু সেই পরিচিত চলার ভঙ্গি যেন কারো নয় !

হঠাৎ কুণালের দৃষ্টি গেল একটি মেয়ে চুপ করে বসে চা বাছাই করছে। ঠিক তপতীর মত। হ্যাঁ, তপতীই বুঝি!

কুণাল সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটি মুখ তুলে তাকাল। বলল: কি চাই বাবু?

না। এ ত তপতী নয়। তবে—এ-ও বাঙ্গালী।

কুণাল বলল: তপতী বলে কোন মেয়েকে চেন তুমি?

: না।

না সে চেনে না।

মেয়েটি বলল: চিনি না ত। বাংলাদেশে বাড়ী তোমার?

: হ্যাঁ।

মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়াল। চুপে-চুপে বলল: ছোটবেলা আড়কাঠিরা আমাকে ধরে নিয়ে আসে এখানে। ওরা বড় অত্যাচার করে। তুমি যদি কোনদিন আমাদের গাঁয়ে যাও, বাবা-মাকে বলো আমায় নিয়ে যেতে।

কুণাল বলল: তোমার দেশ কোথায়?

মেয়েটি চোখ বড় করে বলল: বর্দ্ধমান, অতসীগাঁয়ে।

কুণাল বলল: নাম কি তোমার? আর বাবার নাম?

মেয়েটি টানা-টানা চোখ মেলে তাকাল: আমার নাম? আমার নাম রিক্তা। বাবার নাম জগদীশ।

: হুঃ! * মনে-মনে কুণাল ভাবে: বাবার নাম জগদীশ,

তাই রিক্তাকে রিক্ত করে ছেড়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। পকেট হতে সে মণিব্যাগ বের করল।

বলল ঃ তোমার বাবাকে যদি খবর না-দিতে পারি—টাকা পেলে যেতে পারবে তুমি ?

মেয়েটি আনন্দে নেচে উঠেছে।

বলল ঃ নিশ্চয়ই। আর টাকা পেলে আজই কমলকে নিয়ে পালিয়ে যাব।

কুণাল বলল ঃ কমল কে ?

মেয়েটি বলল ঃ কমল-দা ! এখানেই কাজ করে, বাঙ্গালী। সে-ও আমার মত দুঃখী। ও কাজ করে ওই হোতায়। কমল-দাও থাকতে চায় না এখানে।

বেশীক্ষণ সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়।

কুণাল গুটি-কয়েক নোট বের করে রিক্তার হাতে দিল।

মেয়েটি অবাক্। দশ টাকার সব নোট—দশখানা !

বলল ঃ এত টাকা আমি চাইনে। এত তো লাগবে না।

কুণাল তখন অগ্রসর হয়েছে। বলল ঃ তোমার কমল-দাকে বলো যে অতসী-গাঁ আর নেই। বন্যায় ভেসে গেছে। তাই যেতে হবে না। এদিকেই যেন ব্যবসা করে। পারবে না ব্যবসা ?

মেয়েটি যে কী খুশীই হলো ! কি যে করবে ভেবেই পায় না সে !

বলল ঃ খুব পারবে। কমল-দা ভারী চালাক-চতুর ছেলে। আর বুদ্ধি কি সুন্দর! এ দিয়ে আমরা দোকান করব। ও কি তুমি চলে যাচ্ছ যে?

কুণাল বলল ঃ যাব না কি করব?

মেয়েটি বলল ঃ তোমার পরিচয় ত দিলে না! কমল-দা যখন জিজ্ঞেস করবে, তখন কি বলব বলত?

ঃ বলো যে বাংলাদেশের এক ভাই দিয়ে গেছে তার বোনকে।

ঃ তবে দাঁড়াও, আজকে যে ভাইফোঁটার দিন, একটা ফোঁটা দিয়ে নি!

বলে রিক্তা হাতের ছুরিটা দিয়ে তার সুন্দর শুভ্র অনামিকা আঙুলটির খানিকটা কেটে ফেলল। রক্ত ঝরে পড়ল ঝরঝর করে।

ভাইকে কাছে নিয়ে তার কপালে সেই রক্তের ফোঁটা দিয়ে বলল ঃ তোমার সব ইচ্ছা যেন পূর্ণ হয়। তপতীকে তুমি পাবে।

কুণাল অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল।

রিক্তা ওদিকে গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে-গাইতে চলে গেছে।

নয়

বন্দিনী রাজকন্যা

চা-বাগানের সীমান্ত-প্রদেশের পর বাকী শুধু লৌহ-যন্ত্রের কারখানাগুলি। কুণাল এবারে সেদিকে চলল।

বিরাট কারখানা।

বড় বড় লোহা আর ইট-পাথরের গড়া বিশাল সব ঘর-বাড়ী।

ফারনেসে লোহা গলছে—সেই গলিত লোহা জলস্রোতের মত চলে যাচ্ছে নানা বিভাগে। তা দিয়ে তৈরী হচ্ছে মানবের প্রয়োজনীয় ইস্পাত আর অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী।

ক্ষুধিত রাক্ষসের মত আগুন জ্বলছে দিনরাত।

এ আগুনের কি শেষ নাই?

কিন্তু তপতী কই?

কুণাল খোঁজে। একটার পর একটা খোঁজে, তবু তার দেখা নাই।

অকস্মাৎ তার দৃষ্টি পড়ল একটি মেয়ে দূরে লোহার টুকরো বোঝাই ঝুড়ি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে।

কুণাল তাকিয়ে রইল।

আবারও মেয়েটি এসেছে।

ম্লান চেহারা। বিবর্ণ হয়ে গেছে সমস্ত রঙ্। তবু সমস্ত

চোখে-মুখে করুণা ও আভিজাত্য, লাবণ্য ও প্রতিভা যেন সমস্ত বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে পাহাড়ের পথে ঝরণাধারার মত নেমে এসেছে।

কুণাল একে চেনে।

এই ত সেই! এই ত সেই বন্দিনী রাজকন্যা!

কুণাল সেখান হতেই চীৎকার করে ডাকল: তপতী!

এমন ভাবে কেউ তাকে ডাকতে পারে, মেয়েটি তা কল্পনাও করেনি। সে ভীত কণ্ঠে বলল: কে?

মাথা হতে পড়ে গেছে সেই-লৌহ-সামগ্রী। হতভম্বের মত সে দাঁড়িয়ে আছে।

আর ওদিকে বেত নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সর্দ্দার!

কুণাল মুহূর্ত্তে ছুটে গেল।

কিন্তু ততক্ষণে বেত চলেছে সপাসপ্।

আশ্চর্য্য, মেয়েটির মুখে কান্না নেই! যেন পাথর! তার দু' চোখ বেয়ে শুধু ঝরছে জল।

কুণাল সমস্ত ভুলে আস্তিন গুটিয়ে সর্দ্দারকে মারল এক ঘুসি।

সর্দ্দার হয়তো প্রস্তুত ছিল না। ছিটকে পড়ে গেল দূরে। তারপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল কুণালের ওপর।

কিন্তু কুণালের দুর্দ্দমনীয় শক্তির কাছে সর্দ্দার পরাজিত..

হলো মুহূর্ত্তের মধ্যে। ওদিকে হল্লা শুনে সাহেব-ম্যানেজার এসে দেখলেন দু'জনে মল্লযুদ্ধ হচ্ছে।

দেখলেন—এক বিশিষ্ট ভদ্র-যুবক।

সাহেব বললেনঃ কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

কুণাল বলল ঃ ঐ মেয়েটি আমাদের দেশের।

সাহেব অবাক্ হয়ে বললেন ঃ তুমি বাঙ্গালী, না?

ঃ হাঁ।

সাহেব কি ভাবলেন! বললেন ঃ বাংলাদেশের কাউকে ত রিক্রুট করা হয় না। আইনে নেই।

চীৎকার করে ডাকলেন ঃ সর্দ্দার!

'হুজুর' বলে সর্দ্দার এগিয়ে এলো।

সাহেব বললেন ঃ এই মেয়েটির কি নাম?

সর্দ্দার বলল ঃ ফুলরাণী।

সাহেব এবার তপতীকে ডাকলেন ঃ তোমার নাম ফুলরাণী?

ঃ না। তপতী।

সাহেব হাতের ছড়িটা নাচাতে নাচাতে বললেন ঃ মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, আমার অফিসে চল।

আর তপতীকে বললেন ঃ তুমিও এস।

চলতে-চলতে বললেনঃ বাংলাদেশের কাউকে রিক্রুট করার নিয়ম নেই, তাই ভিন্ন নামে এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে

বোধ হয়। আমি দুঃখিত এজন্য। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে —একে নিয়ে যাও। আমি লিখে দিচ্ছি, এ-মাসের মাইনে দিয়ে দেবে।

কুণাল বলল ঃ ধন্যবাদ! কিন্তু টাকা চাইনে।

সাহেব হাসলেন। বললেন ঃ কোম্পানীকে দিয়ে লাভ কি? নিয়ে যাও।

কুণাল বলল ঃ তবে তুমিই ওর টাকাটা রেখে দিও। এমনি যদি বিপদে পড়ে কেউ, তাকে দিয়ে দিও।

সাহেব কি ভাবলেন। বললেন ঃ ধন্যবাদ তোমায় যুবক! আচ্ছা, তাই হবে। তবে—বিদায়!

শিষ দিতে-দিতে সাহেব চলে গেলেন।

দশ
আবার অন্বেষণ

কিন্তু শেষ এখানেই নয়। তপতীকে পাওয়া গেছে, এ কম কথা নয়; কিন্তু বাবাকে খুঁজে বার করতেই হবে। নতুবা সব যেন পরিহাস!

তপতীকে বলল ঃ এবার চল, দেশে যাই, বাবাকে খুঁজি।

তপতী ধীরে ধীরে বলল ঃ মাকেও দেখে আসব।

কুণাল আকাশের দিকে হাত তুলে বলল ঃ তিনি যে ঐখানে!

তপতী চুপ করে রইল। কোন দুঃখই যেন ওকে আর আঘাত দিতে পারে না। নিঙড়ে গেছে যেন সব রস! কিন্তু তবু আজ তার ভাল লাগছে খুব।

আজ মনে হচ্ছে—পৃথিবীটা একেবারে অসুন্দর নয়। ঐ সুন্দর, সরল, স্বাস্থ্যবান্ তার সেই বাল্যের সাথী কুণালের সাথে চলতে তার ভারী ভাল লাগছে।

বলল ঃ চল, দেশে যাই।

তারা চলল এবার দেশে।

দেশে যেতে কলকাতা দিয়ে যেতে হয়। একবার যে কাকাবাবু, কাকিমা আর সুস্মিতাকে দেখে আসবে, সে সময়ও তার নেই।

কুণাল আস্তিন গুটিয়ে সর্দারকে মারলে এক ঘুসি।

—৬৪ পৃষ্ঠা

ষ্টেশনে বসে সে চিঠি লিখল ঃ

কাকাবাবু,

আজকে যাচ্ছি দেশে। বাবাকে খুঁজতে। সুশ্রিতাকে বল্‌বেন তার তপতী-দি'কে পেয়েছি। আর ভাইফোঁটা দেবার পালা এবার হতে অক্ষয় হয়ে থাকবে সুশ্রিতারই হাতে।

কুণাল

ট্রেন ছাড়ল।

ইস্! কত আস্তে-আস্তে চলে!

দু'ধারে সবুজ বন-বনানী। ছায়া-শীতল ছোট-ছোট কুটীর-গুলি। এঁকে-বেঁকে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটছে। কুণালের মনে হচ্ছে যেন গাড়ী থেমে-থেমে মন্থর গতিতেই চলছে!

এবারে তারা নৌকো করে গাঙের বুকে উঠল।

নদীর জলে দুই পাড় ভেসে গিয়েছে। নদী যেন পৃথিবী-মায়ের পা ধুইয়ে দিচ্ছে কলকল-তান তুলে।

এসে তারা পৌঁছল নিজের গাঁয়ে।

কিন্তু কোথায় তাদের পরিচিত লোকজন? কোথায় তাদের সেই পুরানো বাড়ী-ঘর?

সমস্ত গ্রামের চেহারা বদলে গেছে। গাঁয়ে নেই মানুষ। যারা আছে, তারাও এসেছে অন্য গ্রাম হতে।

জমিদার বুঝি দুর্ভিক্ষের পর তাদের জমিটুকুও কেড়ে

নিয়েছেন—তাই বুঝি ভিন্‌দেশী সব প্রজা এসেছে বসতি নিয়ে! শুধু জমিদারের বাড়ীটাই দেখা যায়।

কুণাল বলল ঃ হৈ-হৈ করে দু'জনে গিয়ে কাজ হবে না। নৌকোয় বস তুমি। আমি খবর পাই কিনা দেখি।

তপতী বলল ঃ তাই ভাল কুণাল-দা!

হেসে বলল ঃ বের করা চাই কিন্তু।

হেসে কুণাল বলল ঃ তোমায় যখন পেয়েছি, বাবাকে পাবই!

তপতী বলল ঃ তা আমি জানি।

বিপিন মুন্সী বসে-বসে কাগজপত্র দেখছিলেন। মনে-মনে ভাবছিলেন সমস্ত গ্রামটা ত এবারে খাসে এসে গেছে, এখন প্রজা বসাতে পারলেই নূতন লাভ। টাকা—টাকা আর টাকা—জীবনে তাঁর ঐ ধ্যান, ঐ জ্ঞান।

তুমি বিপিন মুন্সীকে হয়তো চেন না। অদ্ভুত তাঁর প্রকৃতি! খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অকারণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবেন তোমার সমস্ত খবর। তুমি হয়তো ভাববে গ্রামের জমিদারের কাছে তোমার গোপন বেদনা জানালে হয়তো কিছু সুফল হতে পারে। কিন্তু ভুল—সব ভুল!

তোমার দুঃখ, তোমার দৈন্য এবং তোমার অভাব-অভিযোগ

সব তিনি মন দিয়ে শুনবেন। শেষে বলবেন ঃ ছেলেমানুষ তুমি, পড়াশুনা কর ; ব্যবসা করে কে আবার কবে লাভবান হয়েছে ?

এমনি তাঁর সব বিনামূল্যে উপদেশ !

উপদেশে এবং উচ্ছ্বাসে তোমাকেই শুদ্ধ তিনি উড়িয়ে দিতে চাইবেন। অপমানে ও তাচ্ছিল্যের জ্বালায় তোমার সমস্ত শরীর তখন কাঁপতে থাকবে।

বিপিন মুন্সীর ঐতেই আনন্দ।

প্রত্যেকের দুঃখের খবর জানা—এটাই তাঁর লাভ। ঐ তার মূলধন। সময় মতন তোমার ঐ দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়েই তোমাকে বেশ চাপ দিতে পারা যাবে।

লোকটা একটা অর্থ-পিশাচ।

রূপকথার কাহিনীতে দৈত্যের বর্ণনা আছে, না ? এ-সব জমিদারই সেই দৈত্য।

কুণাল গিয়ে দাঁড়াল বিপিন মুন্সীর সামনে।

মুখ তুলে জমিদার তাকালেন। বেশ লম্বা চেহারা। এখনও —এই বৃদ্ধ বয়সেও স্বাস্থ্যে ও দেহে বলবান। কালে আরো জোয়ান ছিলেন নিশ্চয়ই। যখন ডেপুটি ছিলেন তখন হাতেই হয়ত চেপে মেরে ফেলতে পারতেন মানুষ। এখনও মারেন— তবে কিনা ভাতে !

তাকিয়ে বললেন : কি চাই ছোকরা ?

কুণাল বলল : আমার নাম কুণাল।

: কুণাল ! * জমিদার স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন।

: কই কোন কুণালকে ত চিনিনে। তা খাজনা দিতে এসেছ বুঝি ? বেশ দিয়ে যাও, কিন্তু বকেয়া চলবে না কিচ্ছু।

কুণাল বলল : খাজনা দিতে আসিনি।

: তবে ?

খাজনার ব্যাপার ছাড়া তার কাছে আবার কে আসবে ?

জমিদার গড়গড়া টানতে-টানতে সম্মুখের নায়েবমশাইকে বললেন : শুনছ নায়েব, নবাব-পুত্তুর খাজনা দিতে আসেন নি ! তবে কিসের জন্য আসা হয়েছে রাজকুমার যদি বিবৃত করতেন!

কুণালের শরীর জ্বলতে লাগল। মনে হলো, বলে দুটো চড়া কথা। কিন্তু তাতে এখন লাভ নেই।

ধীরে-ধীরে বলল সে দুর্ভিক্ষের সময়কার সব কথা। জিজ্ঞাসা করল : বাবার খবর কিছু বলতে পারেন ?

গড়গড়া টানতে-টানতে একটু হাসি-মুখে বিপিন জমিদার বললেন : বেশ, বেশ। তা তুমিই তার ছেলে ? ভেবেছিলাম মরে গেছ। তা বেশ। এবার খাজনা-পত্তর দিয়ে দাও সব। কিছু কর-টর ত ?

কুণাল বলল : বাবার খবর কিছু জানেন কিনা তাই বলুন।

ঃ তা তুমি যখন বেঁচেই আছ * বিপিন জমিদার বলতে লাগলেন ঃ তখন টাকা পাওয়া যাবেই। দু' একদিন বাদেই না হয় দিও। আর কি বলছিলে, তোমার বাবার খবর? তা রাখতেই হয—পাওনা-গণ্ডা যখন রয়েছে তার কাছে। দক্ষিণ-গাঁয়ের য়ুনিয়ন-বোর্ডের খাল-কাটার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

আরে—লোকে ত বুঝবে না দেশের জন্যে আমার কত টান! এইত দুর্ভিক্ষ হয় জল না-সরতে পেরে। য়ুনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়েই সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছি। গ্রামের লোক না-খেয়ে মরছিল। প্রজা সব ঢুকিয়ে দিলাম। কোপ্-কোপ্ মাটি কাট্‌ছে আর চাকা-চাকা টাকা পাচ্ছে।

কুণালের এত-সব শোনার আকাঙ্ক্ষা নেই।

বলল ঃ আসি তা হলে এখন। দেখা একদিন করবই আপনার সাথে। হিসেব-পত্তর ভালো করেই মিটবে সেদিন।

জমিদার বললেন ঃ বেশ, বেশ।

কুণাল চলতে লাগল। মনে-মনে বলতে লাগল ঃ এ-ও তোমার একটা চাল হে বিপিন মুন্সী! দেশের উপকারের নামে প্রেসিডেণ্টগিরি চালাচ্ছ—খাল-কাটানো হচ্ছে। বাকী খাজনা আদায় করার জন্য নিরন্ন প্রজাদের দিয়ে কাটাচ্ছ মাটি, আর টাকা পাচ্ছ তোমার ঐ হিসেবের খাতায়! কিন্তু তাদের হাতে শূন্য।

কুণাল চলতে লাগল।

পথে একজন লোককে কুণাল জিজ্ঞাসা করলঃ বলতে পার খাল-কাটা হচ্ছে কোথায়?

সে বললঃ ঐ যে একটু আগেই।

হ্যাঁ। খাল-কাটা হচ্ছে বটে!

কুলি-মজুরের দল কাটছে খাল। দেহে তাদের নেই শক্তি। তবু নিরন্ন প্রজার দল অর্থের জন্য—এতদূর এগিয়ে এসেছে।

লোকগুলো এই দারুণ রোদে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কাজ করছে—তাদের শরীর বেয়ে পড়ছে ঘাম। তাদের অবসর নেই এক মুহূর্ত্ত—পিছনে রয়েছে সর্দ্দারের শাসানি আর নির্ম্মম তাড়না।

হঠাৎ এক দিকে দৃষ্টি পড়তেই কুণাল পাথরের মত দাঁড়িয়ে গেল! কুণালের দুই চোখে বয়ে গেল শ্রাবণ-ধারা। জীবনে এই বুঝি তার প্রথম চোখের জল!

তার বাবা!

ঐ—ঐ ত ওখানে তার বাবা!

বৃদ্ধ—চুল পেকে গেছে। হাঁটুর উপরে মলিন শতচ্ছিন্ন কাপড়। অমন স্বাস্থ্য—ভেঙ্গে পড়েছে তাঁর।

শীর্ণ দেহ থেকে হাড়গুলো ঠেলে বেরিয়েছে, গোণা যায়—একখানা দু'খানা করে।

বৃদ্ধও দেখেছেন তাকে।

তিনি এগিয়ে এলেন ধীরে-ধীরে। মুখে তাঁর ম্লান-হাসি। চোখে জল। কিন্তু উত্তেজনা নেই একটুও।

এগিয়ে এসে ধীরে-ধীরে কুণালকে তিনি টেনে নিলেন বুকে।

বললেন: আঃ, কি তৃপ্তি! ভগবান্—ভগবান্—তুমি আছো, মিথ্যা নও!

কুণাল বলল তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে: বাবা! তপতীকেও পেয়েছি।

এগারো

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে

কুণালের মনে হলো—রূপকথার রাজকুমার এতক্ষণে দৈত্যের হাত হতে নিস্তার পেয়েছে বুঝি! কুচ-বরণ কন্যা তার মেঘ-বরণ চুল নিয়ে কতদিন আশায়-আশায় বসেছিল রাজকুমারের আসার পথ চেয়ে—এবারে সে পেয়েছে তাকে। স্বজন-হারা বান্ধব-হারা রাজকুমারও পেয়েছে মহারাজের দর্শন—শোকে দুঃখে যিনি পাগল হয়ে চলে গিয়েছিলেন দূরবনে।

কুণালের বোধ হলো, সে-ই বুঝি আজ সেই রূপকথার রাজকুমার!

ভাগ্যবান্ সে—আজ সে জয়ী—শুভ তার জয়যাত্রা।

ঃ হ্যাঁ। যাবার পথে স্বামীজির সাথে দেখা করতে হবে।

নৌকা থামল এসে সেই বন্দরে।

আশ্রমের সবার মুখে বিবর্ণ-উদ্বেগ। কি যেন হয়েছে!

একটি সেবক এগিয়ে এল। বলল ঃ কাকে চাই?

কুণাল বলল ঃ স্বামীজি।

সেবকটি মাথা নত করল। বলল ঃ আসুন আপনারা আমার সাথে।

কিসের এত বেদনা এই যুবকটির ?

কুণাল অগ্রসর হলো। সাথে তার বাবা আর তপতী।

সেবকটি ধীরে-ধীরে নিয়ে এলো তাদের এক নদীতটে। সেখানে ছোট্ট একটি মন্দির। মন্দিরের মধ্যে সমাধি।

সমাধির গায়ে লেখা :

ক্লান্ত স্বামীজি হেথা
লভিলা বিরাম,
তাঁরি পুণ্য দেহ-শেষ
ঘোষে আজো নাম।

মুগ্ধ-বিস্ময়ে কুণাল তাকিয়ে রইল।

তারপর কুণাল বেদীর ধারে নীচু হয়ে প্রণাম করল—পাশে তার তপতীও।

পিতাও প্রণাম করলেন।

সম্ভবতঃ স্বামীজির মুক্তাত্মা তখনও সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন !

স্বামীজি নেই। আজ তাঁর কথা ভাববার সময় এসেছে।

তিনিও ছিলেন জমিদার; কিন্তু জমিদারী ও আই-সি-এসের মোহ ত্যাগ করে, দেশ ও দশের সেবায় নিয়োগ করে-ছিলেন নিজকে। মৃত্যু দিয়ে গেছে তাঁকে পরম শান্তি। কিন্তু সেই সেবাব্রতী দরিদ্র-নরনারায়ণ-পূজককে বিশ্ব হারাল কার অভিশাপে ?

কুণাল বলল ঃ তপতী !

ঃ কী ?

কুণাল বলল ঃ বলত তপতী, সুখ-দুঃখ এরা কি একই পথ ধরে চলে ? জানো, স্বামীজি আজ আমাদের দেখে কী খুশীই হতেন !

তপতী চুপ করে রইল।

সাঁঝের আঁধার ধীরে-ধীরে পৃথিবীতে নেমে আসছে। সমাধি-মন্দির হতে ভেসে আসছে ধূপ ও ধূনার গন্ধ।

বাবাকে কুণাল পেয়েছে, পেয়েছে তপতীকে, আর পেয়েছে জীবনে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু অলক্ষ্য ইঙ্গিতে যিনি দিলেন পথের সন্ধান, তিনিই চলে গেলেন সকল কিছুর ঊর্দ্ধে—অলক্ষ্যে।

স্বামীজি আর নেই।

কুণাল শিশুর মত কাঁদতে লাগল।

মনের গোপন অন্তঃস্থল হতে প্রতিজ্ঞা বেরিয়ে এল তার—ভবিষ্যৎ জীবনের যা-কিছু ঐশ্বর্য্য, সব সে ব্যয় করবে স্বামীজির আকাঙ্ক্ষিত পথে।

কুণাল বলল ঃ চল তপতী, চল।

ওদিকে তখন রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু কুণাল কি আর তখন অন্ধকারকে ভয় করে ?

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে আজ সে রাজপুরীর যাত্রাপথে

বিজয়-নিশান উড়িয়ে চলেছে। অন্ধকার আজ তার কাছে আলোময়।

যেতে-যেতে কুণাল হঠাৎ থেমে গেল। তারপর হাঁটু গেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা বলল ঃ হে মানব-মনের অধীশ্বর স্বামীজি, প্রণাম নিও। আমায় তুমি সুপ্রতিষ্ঠ করেছ, আমার কল্পনাকে সত্যি করেছ। তোমারই সোণার কাঠির পরশে সহজ ও সুগম করেছ আমার জীবন-পথ—তেপান্তরের মাঠ। এখন সত্যিকার মানুষ করে তোলো দয়াময়!

ধীরে-ধীরে নোঙ্গর উঠিয়ে নৌকো আবার নদীর স্রোতে ভাসল।